লজ্জা তখন লজ্জা এখন

শিবনারায়ণ রায়

মৌলবাদীদের চাপে তসলিমা নিরাশ্রয় হলে ভারতের উদার ইমেজ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা

ভারতবর্ষ স্বাধীন গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানকার সংবিধানে স্বাধীন চিন্তার, স্বাধীন মত প্রকাশের, স্বাধীন চলাফেরার মৌল মানবিক অধিকার সগর্বে স্বীকৃত। অপরপক্ষে শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া এবং রক্ষা করাও এদেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। তসলিমা ভারতে অনেকবার এসেছেন, থেকেছেন। তাঁই বই প্রবন্ধাদি এখান থেকেই একটির পর একটি প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা অগণিত। তাঁর সাহিত্যকৃতি এবং চিন্তা ওপ্রকাশের বলিষ্ঠতার জন্য তিনি এদেশে এবং পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে অভিনন্দিত এবং পুরস্কৃত। স্বভাবত তাঁর চিন্তার বিস্তর সমালোচনাও হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সরকারের মতোই পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকারই প্রথম তাঁর একটি বই নিষিদ্ধ করে।

আপাতদৃষ্টিতে তাতে ক্ষতি হয়নি। উচচতর আদালত সেই নিষেধকে খারিজ করে দেয় এবং তাতে বইটির খ্যাতি এবং পাঠক সংখ্যা বাড়ে বই কমে না।

কিন্তু অন্যদিক থেকে মস্ত ক্ষতিও হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট সরকার তসলিমার প্রতি বিমুখ হয়েছে। তসলিমার কলকাতায় ফিরে আসা তাঁরা চান না। তা সম্পর্কে সামান্য সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি এবং যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার টিঁকে যাবার জন্য লোকসভায় কমিউনিস্ট ভোটের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল, পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকারের ইচ্ছা - অনিচ্ছাকে আগ্রহ্য করবার মতো সামর্থ্য তাদের নেই। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে যে দুটি ব্যবহারিক বিকল্প প্রত্যক্ষ সে দুটিই কিন্তু নীতি বিগর্হিত। একটি হল, তসলিমার ভিসা বা প্রবাসাজ্ঞার সময় না বাড়িয়ে তাঁকে এদেশের আশ্রয়ে বঞ্চিত করা। অন্যটি হল, তাঁকে নিরাপত্তার ঘের দিয়ে আত্মীয়-বন্ধু, অনুরাগীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এবং তাঁকে তাঁর স্বাধীন চিন্তা - প্রকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। অর্থাৎ একজন সৃজনশীল শিল্পী এবং ভাবুককে মৌনব্রতী হতে বাধ্য করা। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি রফা হিসেবে প্রস্তাব করেছেন কলকাতার বদলে তসলিমা যদি দিল্লির বাঙালির উপনিবেশ চিত্তরঞ্জন পার্কে চুপচাপ থাকতে রাজি হন, তাঁর ব্যবস্থা হয়তো করা যেতে পারে। সেখানেও অবশ্য বস্তুত গৃহবন্দি অবস্থায় বাস করতে হবে। জানি তসলিমা নিপায় হয়ে এ প্রস্তাব মেনে নেবেন কি না।

কিন্তু এটুকু জানি তাঁর মতো স্বাধীনচিত্ত লেখিকার পক্ষে চিত্তরঞ্জন পার্কের প্রায় মনন রিক্ত নিস্তরঙ্গ পরিবেশ নিতান্তই বেমানান। কলকাতায় যত ত্রটিই থাক সেখানে এখনও পর্যন্ত নানামুখী ভাবনা - চিন্তার প্রবল স্রোত বহমান। তসলিমার মতো অকুতোভয় বিদ্রোহিনী প্রতিভার পক্ষে কলকাতাই তো উপযুক্ত পরিবেশ।

যেহেতু তসলিমা মুসলমান পরিবারে জন্মে ইসলাম ধর্মের নানা বিধিনিষেধে নাড়া দিয়েছেন সেজন্য মৌলবাদীরা তাঁর বিদ্ধে মৃত্যুদণ্ডেড ফতোয়া জারি করেছে। জন্মভূমি থেকে তিনি নির্বাসিত। ভারত সরকার এদেশে তাঁকে সাময়িকভাবে বাস করবারঅনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকার তাঁকে এখানে থাকতে দিতে চান না। তার কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবার জন্য মৌলবাদ নিয়ন্ত্রিত মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন তাঁদের কাছে অপরিহার্য। কোথায় তাঁরা এখানকার মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষা, ধ্যান - ধারণা, মূল্যগ্রাম, প্রগশীলতার সম্প্রসারণের চেষ্টা করবেন, তা নয়, তাঁরা ক্ষমতার মোহে ইসলামের ক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদকেই প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। এটা যে আত্মঘাতী পথ জ্যোতিবাবু এবং বুদ্ধবাবুর মতো বুদ্ধিমান নেতারা কি বুঝতে চান না?

তবে ভারত সরকার যেমন বর্তমানে কমিউনিস্ট সমর্থনে নির্ভরশীল, তেমনি বিশ্বের সামনে আধুনিক ভারতের যে সম্মানিত ইমেজ গড়ে উঠেছে সেটিকে বজায় রাখা ভারত সরকারের অবিচ্ছেদ্য দায়িত্ব। এই ইমেজ গড়ে তোলায় গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল, আম্বেদকর, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ইত্যাদির ভূমিকা আছে। মৌলবাদীদের চাপে যদি তসলিমা শেষ পর্যন্ত নিরাশ্রয় হন, বিশ্বের সামনে ভারতের এই সযত্নে রচিত ইমেজ ভেঙে পড়ার যথেষ্ট আশংকা আছে। তাই এ সংকটের অবস্থাতেও একটা সম্মানজনক রফার সম্ভাবনা আছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি নিশ্চিত তসলিমা তাঁর অভিজ্ঞতা - ঋদ্ধ জীবনে বর্তমান সংকটকে অগ্নিপ্রভা ভাষায় রূপ

দেবেন এবং আজ হোক বা কাল হোক, প্রাণ চঞ্চল এই কলকাতা শহরই আবার তসলিমাকে সাগ্রহে আপনার জন বলে গ্রহণ করবে।

মৌলবাদী তোষণে এপার - ওপার এককাতারে
গিয়াসুদ্দিন

১৯৯৪ সালে যে নগ্ন ও হীন কৌশলে এবং নিষ্ঠুর অমানবিকতায় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বাংলাদেশ থেকে তসলিমাকে চির - নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবেই আমাদের তথাকথিত সংস্কৃতিবান মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাসিত করলেন। খালেদা জিযা সরকারের প্রচ্ছন্ন মদত ও প্রশ্রয় পেয়ে মুসলিম মৌলবাদীরা প্রথমে তসলিমার বিদ্ধে বল্গাহীন অপপ্রচার ও কুৎসারবন্যা বইয়ে দিয়েছে জনমনকে ক্ষুদ্ধ করে তুলে, তারপর তার 'তসলিমার মুণ্ডু চাই' ধবনি তুলে ঢাকার রাজপথে তাণ্ডব শু করে। খালেদা জিয়া মৌলবাদীদের কুৎসা প্রচারে, মুণ্ডু চাই ফতোয়ায় এবং হিংসাত্মক তাণ্ডবে কোন দোষ দেখতে পাননি। দোষ দেখেছিলেন তসলিমার। তারপর তসলিমার জন্যই যত অশান্তি হচ্ছে বলে নিরাপত্তার অজুহাতে তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। কী আশর্চ্য! পশ্চিমবঙ্গেও সেই একই চিত্রনাট্য মঞ্চস্থ হল।
খালেদা জিয়া যা করেছিলেন তা অপ্রত্যাশিত হয়ত ছিল না, কিন্তু বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের নিকট এটা ছিল অপ্রত্যাশিত কারণ তাঁর দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল পরীক্ষিত। এই প্রসঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সরকারের ভূমিকা আরও ন্যক্কারজনক। এরা পুলিশকে দিয়ে জোর করে রাজস্থানের ট্রেনে তুলে দিয়ে বলেছে তসলিমা স্বেচ্ছায় চলে গেছেন। বিজেপি শাসিত রাজস্থানে পাঠানোর উদ্দেশ্যই হলো তসলিমার ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করা। নিজেদের দোষআড়াল করতে এবং একই সঙ্গে অপরের শ্বেতশুভ্র ভাবমূর্তিকে কলঙ্কলেপনে এত মিথ্যাচারও করা যায়!
কয়েকদিন নীরব থেকে অবশেষে তসলিমা স্বয়ং জানিয়েছেন, তিনি স্বেচ্ছায় কলকাতা পরিত্যাগ করেননি এবং কলকাতায় ফেরার জন্য অতিশয় ব্যাকুল। তসলিমার ব্যাপারে বুদ্ধদেবরা যতই হাত ধুয়ে ফেলুন মানুষ তা বিশ্বাস করবে না। কারণ ২০০৫ সালেই বুদ্ধদেব কেন্দ্রকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁরা চান না তসলিমা কলকাতায় পাকাপাকি থাকুন। এই মর্মে ১৮/৩/০৫ তারিখেদৈনিক স্টেটসম্যানই প্রথম খবর ছাপিয়েছে।
বাবরি মসজিদ ধবংসের পর বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের (হিন্দুদের) ওপর যে বীভৎস ও নারকীয় অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালানো হয়েছিল তার ওপরে তসলিমার লেখা 'লজ্জা' বইটির জন্য মুসলিম মৌলবাদীরা (এপারেও) তাঁর ওপর চরম ক্ষিপ্তহয়ে ওঠে। এরকম একটি সাহসী বই লেখার জন্যে তসলিমার প্রাপ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। কিন্তু ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতৃত্ব কণ্ঠ মিলিয়েছিল মুসলিম মৌলবাদীদের সঙ্গেই। তখন থেকেই মুসলিম মৌলবাদীদের তুষ্ট ও তোয়াজ করতে বারবার বুদ্ধবাবুরা তসলিমাকে বলির পাঁঠা করেছেন।
মুসলিম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় ২০০৩ -এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বুদ্ধবাবুরা গো - হারান হারেন। তাই মুসলিম মৌলবাদীদের দাবি মেনে ২০০৪ এর লোকসভা মির্বাচনের প্রাক্কালে বুদ্ধবাবু তসলিমার 'দ্বিখণ্ডিত' বইটি নিষিদ্ধ করে লেখকের বাক্স্বাধীনতা হরণ করেন। কিন্তু, তাতেও মোল্লাতন্ত্র - তোষণে তাঁরা হতোদ্যম হননি। ৩০/৪/২০০৫ -এর 'স্বর ও আবৃত্তি' নামের একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা তসলিমাকে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন! মুসলিম মৌলবাদীরা হুংকার দিল, তসলিমা মেদিনীপুরে ওই অনুষ্ঠানে গেলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। বুদ্ধদেবের সরকার অমনি মাথা নত করল, অনুষ্ঠানই বন্ধ করে দিল। গতবারশিলিগুড়িতে বইমেলা উদ্বোধনে তসলিমা আমন্ত্রিত, মুসলিম মৌলবাদীদের একই হুমকিতে, ফের মাথা নত বুদ্ধদেব সরকারের।এবার আয়োজকদের বাধ্য করা হল তসলিমার আমন্ত্রণ বাতিল করতে। একদিকে নারীবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ তসলিমা এবং অপরদিকে মুসলিম মৌলবাদী শক্তি - এই দুটোর মধ্যে বুদ্ধবাবুদের পছন্দ মোল্লাতন্ত্রই।
কাজেই তসলিমাকে যে ওঁরা তাড়িয়ে দেননি তাতে আশর্চ্য হবার কিছু নেই।
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মুসলিম মৌলবাদীদের একটা অশুভ বোঝাপড়া যা এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, গত ২১ নভেম্বর তা যেন অনেকখানি বেআব্রু হয়ে পড়ল। মুসলিম মৌলবাদীরা দিনভর কলকাতার রাজপথে তাণ্ডব চালাল তসলিমার ভিসা বাতিলের দাবিতে। আর দিনের শেষে বিমান বসুর কণ্ঠে শোনা গেল সেই দাবিরই প্রতিধবনি। ধর্মের নামে দুষ্কৃতিরা পুলিশের ওপর হামলা চালাল, বাস - ট্রাম জ্বালাল, গোটা কলকাতাকে জিম্মা করে রাখল সারাদিন অথচ সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মারমুখী পুলিশ কী সংযম-ই(পুলিশের এমন সংযত আচরণ থাকে না গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে) না দেখাল। আবার ঐ হিংস্র ও উন্মত্ত মৌলবাদীরা কত শান্ত ও

সংযত আচরণ কতল যখন দিনান্তে বিমান বসু ঐ হামলাপীড়িত অঞ্চলে শান্তিযাত্রা করলেন। মৌলবাদীরা যতখুশি গুণ্ডামি করবে কিন্তু পুলিশ কিছু বলবে না। আবার বিমান বসু সন্ধ্যায় তথাকথিত শান্তিমিছিল করবেন। কিন্তু মৌলবাদীরা কিছু বলবে না বা! কী সুন্দর বোঝাপড়া।

আর এই ঘটনার পরের দিনই কলকাতা থেকে রাজস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হল তসলিমাকে। কী দাণ কুনাট্য আর কী দাণ তার সঞ্চালন (বাস্তবায়ন) তসলিমা বিতাড়নে! বুদ্ধদেবের সরকার তসলিমাকে তাড়ানোর ষড়যন্ত্র করেছিলেন আর একদফা কিছুদিন পূর্বে। লালবাজারের পুলিশের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন সেই ষড়যন্ত্র হাসিল করার অপপ্রয়াস। কলকাতা থেকে ষড়যন্ত্র করে যেভাবে তসলিমাকে নির্বাসিত করা হল তা শুধু এটা আমাদের বাংলার, বিশেষ করে কলকাতার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরোধীও। গত শতকের কুড়ি ও তিরিশ দশকের মুসলিম মৌলবাদীরা কাজি আব্দুল ওদুদ, কাজি মোতাহার হোসেন, কবি আব্দুল কাদির, আবুল হোসেন প্রমুখ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের ইসলামের শত্রু ও কাফের তক্‌মা দিয়ে প্রকাশ্যে নাকখত দিতে বাধ্য করে। শেষ অবধি এই বুদ্ধিজীবীগণ আত্মরক্ষার্থে ঢাকা থেকে কলকাতায় পালিয়ে আসেন। কলকাতা তাঁদের পরম আদরে বুকে স্থান দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ মুজতবা আলিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় পালিয়ে এসে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন কাব্যপ্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ ইকবালের চাইতে বড় ছিলেন। সেজন্যে মুসলিম মৌলবাদীরা তাঁকে নাস্তিক ও হিন্দুর দালাল বলে তাঁর ওপর হামলা করেছিল।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক সেনা ও মুসলিম মৌলবাদীদের আক্রমণে প্রায় এককোটি বাংলাদেশি শরণার্থী ভারতে এসেছিল। তাদের নববই শতাংশকেই কলকাতা ও পশ্চিমবাংলা আপন বুকে ঠাঁই করে দিয়েছিল। এই হল কলকাতার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ঢাকা থেকে ধর্মীয় মৌলবাদীদের আক্রমণে যাঁরা এসেছেন কলকাতা তাদের ফিরিয়ে দেয়নি, বুকে টেনে নিয়েছে। রাজা রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রও যে সমাজসংস্কারের আন্দোলন করেছিলেন তাতে হিন্দু ভাবাবেগে কম আঘাত লাগেনি এবং হিন্দু মৌলবাদীরা তাদের ওপর কম খড়গহস্ত ছিলেন না কিন্তু তার জন্য কলকাতা তাঁদের মুণ্ডু চায়নি বা কলকাতা তাঁদের তাড়িয়ে দেয়নি। মুসলিম মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সরকার যেভাবে তসলিমাকে কলকাতা থেকে নির্বাসিত করল তা কলকাতার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করল। এর প্রতিবাদে কলকাতা সরব হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যেভাবে ফেটে পড়া উচিত ছিল তা দেখা গেল না। এটাও কলকাতার সংস্কৃতি নয়।